

আপনি যখন বাবা

ড. করিম আশ শায়লি

মুকুন
পাবলিশিং

সূচিপত্র

গুরুত্ব কথা.....	১১
কেন সন্তানের প্রতি যত্ন নেবেন?.....	১৫
আদর্শ বাবার পরিচয়.....	১৮
সন্তান যেভাবে শিখে.....	২৭
একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা.....	৩৩
সন্তানকে নিয়ে পরিকল্পনা.....	৩৫
শৃঙ্খলার পাঠ.....	৩৮
সন্তানকে কিছু স্বাধীনতা দিন.....	৪০
যখন তাকে শাস্তি দিবেন.....	৪২
ধমক দেওয়ার আগে.....	৪৩
বাবা-মা'র চিন্তার অভিন্নতা.....	৪৫
মায়ের প্রতি বাবার দায়িত্ব.....	৪৭
সন্তানকে কখন প্রহার করবেন.....	৫০
আবেগের নিয়ন্ত্রণ.....	৫৪
শাসনে পরিমিতিবোধ.....	৫৬
সন্তানের সাথে কথা বলা.....	৫৮
সন্তান আপনাকে অনুসরণ করছে.....	৬০
আদর্শ ও নৈতিকতার পাঠ.....	৬৩
বিবেকের পরিচর্যা.....	৬৬
পড়াশোনায় অমনোযোগী হলে.....	৬৯
মেধা ও পরিশ্রমের মূল্যায়ন.....	৭২

খেলতে খেলতে শেখা.....	৭৪
তার সাথে ইতিবাচক কথা বলুন.....	৭৯
ভুলের সমালোচনা.....	৮২
সাফল্যের স্বীকৃতি.....	৮৪
পুরস্কার যখন ক্ষতির কারণ.....	৮৭
কথা দিয়ে কথা রাখা.....	৮৯
ভালোবাসার নেপথ্য কারণ.....	৯১
আপনি যখন ভুল করেন.....	৯৪
আদেশ নয়, বরং অনুরোধ.....	৯৬
প্রতিভার পরিচর্যা.....	৯৮
সন্তানদের মাঝে সমতা.....	১০০
স্বপ্ন দেখতে শেখান.....	১০৩
এত এত প্রশ্ন!.....	১০৬
শিশু হয়ে যাওয়া.....	১১২
অনুভূতিগুলো বুঝুন.....	১১৪
কোনোরকম জোরাজুরি নয়.....	১১৬
বহুমুখী দক্ষতার পাঠ.....	১২১
আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন.....	১২৫
মেধার মূল্যায়ন.....	১৩০
অন্যের সাথে তুলনা নয়.....	১৪০
শিশুর গুরুত্বপূর্ণ বয়স.....	১৪৩
আত্মবিশ্বাসের পাঠ.....	১৪৭
তাকে পড়ুয়া বানান.....	১৫১
সন্তানের রুটিন জীবন.....	১৫৭
ডিভাইস আসক্তির লাগাম.....	১৫৯
সে তো বড় হয়ে গেছে.....	১৬৪
বয়ঃসন্ধি.....	১৬৮



আদর্শ বাবার পরিচয়

প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী সব পুরুষই একসময় ঠিক বাবা হয়ে যান; কিন্তু সবাই আদর্শ বাবার গুণাবলী নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারেন না। এখানে আমি একজন আদর্শ বাবার ব্যক্তিত্ব ও পরিচিতি তুলে ধরছি।

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়—অনেকেই সন্তানের যত্ন নেওয়া ও সন্তান প্রতিপালন করার মাঝে পার্থক্য করতে পারেন না। তারা বাচ্চা লালন-পালন করার সাথে নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে সন্তানকে গড়ে তোলাকে গুলিয়ে ফেলেন। সন্তান লালন-পালন করার অর্থ হচ্ছে, তার খাবার, পোশাকসহ আনুষঙ্গিক সব কিছুর ব্যবস্থা করা। আর পরিচর্যা বলা হয়, বাচ্চাকে ভালো-মন্দ বিচার করতে শেখানো, হালাল-হারামের সাথে পরিচিত করা এবং করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। কিন্তু আফসোস, আমি অনেক বাবাকে সন্তানের নৈতিক অধঃপতন দেখে হতাশা প্রকাশ করতে দেখেছি। তারা বলেন, ‘আমি আমার সন্তানের জন্য কী-না করেছি। তার জন্য সবধরনের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করেছি। তাকে নামিদামি স্কুলে পড়িয়েছি। সব রকমের সুখেশ্বর্য তার সামনে এনে হাজির করেছি। তার যখন যা লাগে তাই তাকে দিয়েছি। কজন বাবা সন্তানের জন্য এতকিছু করে? এতকিছুর পরও কেন সে আমাকে নিরাশ করবে!’

এই পিতা ভেবেছেন, অর্থ-সম্পদ ব্যয় করলেই দায়িত্ব শেষ। আসলে তিনি তার সন্তানকে প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছেন। তিনি তার সময়, মন ও মনোযোগ সন্তানের পিছনে ব্যয় করতে কার্পণ্য করেছেন। ফলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে, অর্থকড়ির চেয়ে এগুলোই বহুগুণে জরুরি ছিল।

আমার এক বন্ধু অত্যন্ত ভদ্র, উত্তম আখলাক ও বেশ মার্জিত স্বভাবের অধিকারী। সে তার ছোটবেলার একটি ঘটনা আমাকে শুনিয়েছিল। ঘটনাটি তার শিশু মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে, এমনকি তার জীবন গঠনেও বড় ভূমিকা রেখেছে।

সে বলেছিল, “আমার বাবা আমাদের সব বিষয়ে খুব সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। একবার আমার একটি নোটবুক কেনার দরকার পড়ে। কিন্তু রাতে আমি বাবাকে সে কথা জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম। সকালে উঠে দেখি, তিনি কাজে চলে গিয়েছেন। তখন মায়ের কাছে টাকা চাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। আমার মা আমাকে যে টাকা দিলেন, তাতে নোটবুক কেনার পরেও কিছু টাকা থেকে যাবে। তিনি বলে দিলেন, ঘরে ফিরে বাকি টাকা যেন তাকে ফিরিয়ে দেই। আমি স্কুল থেকে ফিরে বাকি টাকা ফেরত দিতে বেমালুম ভুলে গেলাম। সেদিন বাবার বাড়িতে ফিরতে বেশ রাত হচ্ছিল, তাই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি ঘরে ফিরে আমাদের পাঁচ ভাইয়ের জামাকাপড় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। এক পর্যায়ে তিনি আমার জামার পকেটে নোটবুক কেনার পর অবশিষ্ট টাকা পেয়ে গেলেন। কোনো ছোট ছেলের কাছে সেটি বেশ বড় অঙ্কের টাকা ছিল। আমি এই টাকা কোথায় পেতে পারি ভেবে তিনি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি সকাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারলেন না। আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কানের কাছে এসে বললেন, “বাবা, আমি তো তোমাকে আজকে কোনো টাকা দেইনি, তুমি এই টাকা কোথায় পেলে?” কাঁচা ঘুমের মাঝে ডেকে তোলার কারণে এমনিতেই আমার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গিয়েছিল। আমি বিরক্ত গলায়

বললাম, “বাবা, এ কথা কি সকালে জিজ্ঞেস করলে হতো না?” বাবা বললেন, “না বাবা, এটা না জানা পর্যন্ত রাতে আমার ঘুম আসবে না।” আমি বললাম, “আজকে একটা নোটবুক কেনার জন্য মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলাম। সেটা থেকে কিছু টাকা রয়ে গেছে। আমি মাকে ফিরিয়ে দিতে ভুলে গেছি।” এটা শুনে তিনি শান্ত হলেন। তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি বড় বাঁচা বেঁচে গেছেন।’

এই ঘটনায় আমরা একজন সচেতন বাবার পরিচয় পেলাম। যিনি তার সন্তানদের লাগামহীন ছেড়ে দেননি। তাদেরকে কালের স্রোতে হারিয়ে যেতে দেননি। তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি। এতে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে।

একজন আদর্শ বাবার মাঝে যেসব গুণাবলী থাকা জরুরি, তা আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করব। কেননা, বাবার শাসন, উপদেশ ও শিক্ষার প্রভাব শিশুর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। আমরা যদি একজন পিতার সকল বৈশিষ্ট্যকে এক কথায় প্রকাশ করতে চাই, তাহলে বলা যেতে পারে—একজন সফল পিতা হতে হলে তাকে অবশ্যই বিচক্ষণ, শান্ত প্রকৃতি ও শুদ্ধ অন্তঃকরণের অধিকারী হতে হবে। তাকে সর্বাবস্থায় সুন্দর ও সঠিক পথটি বেছে নিতে হবে। মিথ্যা ও কদর্যতা সতর্কতার সাথে এড়িয়ে চলতে হবে।

যে শিশু সত্য ও নিষ্ঠার মাঝে বেড়ে ওঠে, দুনিয়ার কোনো শক্তি তাকে দুর্বল করতে পারে না। পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক, শিশুর কোমল মানসপটে ইসলামের আদর্শ একবার গেঁথে গেলে সকল প্রতিকূলতা তার সামনে তুচ্ছ হয়ে যাবে। অবস্থা যতই জটিল হোক, শিশুর আত্মবিকাশের জন্য দ্বীনি ভাবধারার পরিবেশের কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং, একজন আদর্শ বাবা হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে আপনার করণীয় কয়েকটি পরামর্শ উল্লেখ করছি।



সন্তান যেভাবে শিখে

পরিবার

আমাদের সবার মনে একটা প্রশ্ন থাকে, আমার বাচ্চা উত্তম আখলাক, মার্জিত স্বভাব ও সুন্দর আচরণ কোথা থেকে শিখবে?

এর উত্তরে আমি বলব, প্রথমত একটা বাচ্চা তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঠগুলো নিজের ঘর এবং পরিবার থেকে গ্রহণ করে। শিক্ষাবিদ ও শিশু মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, শিশুরা তার ঘর থেকে ভালো অভ্যাসগুলো রপ্ত করে। শিশুর আচরণগত সৌন্দর্য এবং মনোজাগতিক বিকাশে পরিবারের বড় ভূমিকা রয়েছে। শিশু যখন বুঝতে শুরু করে সে তখন থেকেই পরিবারের সদস্যদের দেখে এবং একটা বয়স পর্যন্ত বেশ লম্বা সময় সে তাদের সাথেই অবস্থান করে। সুতরাং পারিবারিক বন্ধন ও সুসম্পর্ক এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক মনে করা হয়।

‘রিডার ডাইজেস্ট’ পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে—৬০% শিশু তাদের পরিবারের সকল সদস্যের সাথে সপ্তাহে ন্যূনতম চারবার একত্রে বসার সুযোগ পায়। এগুলো শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করে।

সন্তানের সাথে আপনার সম্পর্ক স্বাভাবিক ও সহজ করতে হবে। তার সাথে আপনার বন্ধন যতটা দৃঢ় এবং বোঝাপড়া যতটা গভীর হবে, আপনি তার ততটা কাছাকাছি পৌঁছাতে পারবেন এবং সে-ও আপনাকে ঠিত ততখানি অনুভব করবে। এভাবেই বাবা-মায়ের সাথে শিশুর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তার কোমল হৃদয়ে বাবা-মায়ের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আস্থা জায়গা করে নেয়। ফলে বাহিরের যেকোনো আকর্ষণ তাকে ঘরের থেকে বিমুখ করতে পারে না। যদি বাহির থেকে কোনো বদঅভ্যাস নিয়ে ঘরে ফেরে-ও, তাহলে তা সংশোধন করা সহজ হয়ে যায়।

অভিভাবক হিসাবে আমাদের করণীয় হলো, ঘরে থাকাবস্থায় আমাদের আচরণ সংযত রাখতে চেষ্টা করা। কেননা শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। তারা একবার যা দেখে তাই শিখে ফেলে এবং সেটা তাদের মানসপটে গেঁথে যায়। অতএব শিশুদের সামনে আমাদের কথাবার্তা ও আচরণ-উচ্চারণে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

দ্বিতীয়ত, শিশুর শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ হচ্ছে তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শিশুর মেধা বিকাশ ও সুস্থ মানসিকতার জন্য মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য। একটা শিশুর জীবনে শিক্ষা-দীক্ষা, নৈতিকতা ও আদর্শিক অবস্থান গড়ে দিতে শিক্ষক যে ভূমিকা পালন করেন, তা বাবা-মায়ের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। শিশুরা দিনের একটা বড় অংশ বিদ্যালয়ে কাটায়। সেখানে বন্ধুবান্ধবের সাথে খেলাধুলা ও সহপাঠীদের সাথে পড়াশোনার মাধ্যমে তারা শারীরিকভাবে সুস্থ ও মানসিকভাবে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

সকল বাবার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, তারা যেন তাদের কলিজার টুকরা সন্তানদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে নিশ্চিত হয়ে না যান। বরং

সন্তানের উঠাবসা, চলাফেরার প্রতি খুব সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। মাঝেমধ্যে বাচ্চার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাবেন, শিক্ষকদের সাথে কথা বলবেন, বাচ্চার পড়াশোনা সহ সার্বিক বিষয়ে খোঁজখবর নেবেন, তার প্রতিভা সম্পর্কে শিক্ষকদেরকে ধারণা দেবেন এবং তার ত্রুটি ও দুর্বলতার ব্যাপারে জানতে চাইবেন, সর্বোপরি তাকে যোগ্য মানুষরূপে গড়ে তুলতে শিক্ষকদের সহযোগিতা চাইবেন।

সমাজ ও পরিবেশ

তৃতীয়ত, একটি শিশু তার চারপাশের পরিবেশ এবং সমাজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কেননা মানুষের জীবনে যেকোনো পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে পরিবেশ একটি অন্যতম প্রভাবক। বাচ্চার জন্য আপনি যেমন পরিবেশ চান, তা হয়তো আপনার পক্ষে সবসময় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না, তবে আপনি চাইলে আপনার ঘরে বাচ্চার উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারেন। কেননা বাইরের অনেক কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না, সামাজিক অনেক বিষয় আমরা আমাদের সন্তানের জন্য অপছন্দ করলেও সেটা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখি না; তাই আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আমরা তো তাদেরকে বাইরের অসুস্থ পরিবেশে লাগামহীন ছেড়ে দিতে পারি না যে, তারা ইচ্ছামতো যা খুশি তাই করে বেড়াবে। আবার দরজা বন্ধ করে ঘরে আটকে রাখাও সম্ভব না; এতে তার আত্মবিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সমাজ-বিচ্ছিন্নতার কারণে তার মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে, তার মধ্যে লজ্জা, জড়তা ও আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব তৈরি হবে।

এর সমাধান হলো—তারা বাইরে যাবে, মানুষের সাথে মিশবে; তবে যত কষ্টই হোক, আমাদেরকে সার্বক্ষণিক নজরদারি করতে হবে। সেই সাথে তাদেরকে উত্তম আখলাক এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য শেখাতে হবে। তার সামনে কোনো বাচ্চার ভালো গুণ এবং অন্য বাচ্চার



সন্তানকে কখন প্রহার করবেন

সন্তানকে কখন প্রহার করা উচিত; এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার আগে সন্তানকে প্রহার করার কারণ নিয়ে কিছু কথা বলা জরুরি মনে করছি। আমার মনে হয়, জরিপ করলে দেখা যাবে—পঁচানব্বই ভাগ মানুষ তাদের সন্তানকে কোনো কিছু শিক্ষা দেবার জন্য কিংবা ভুল শুধরানোর জন্য প্রহার করেন না; বরং নিজের রাগ প্রশমিত করার জন্য তাদেরকে প্রহার করে থাকেন। এরচেয়েও নিষ্ঠুর আচরণ হলো, বাচ্চার সমবয়সী বন্ধুবান্ধব, অপরিচিত লোক বা অতিথির সামনে তাকে মারা কিংবা তার কোনো দোষ প্রকাশ করে তাকে অপমান করা। শিশু মনোবিদরা বলেন, যেসব বাচ্চারা এ ধরনের মানসিক চাপ ও ভীতিকর পরিবেশে বেড়ে ওঠে তারা নিজেদের ওপর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তারা আরও বলেছেন, বাচ্চারা কোনো ভুল করলে প্রথমেই প্রহার করা একটি ভুল পদক্ষেপ। অনেকে প্রহার করাকেই একমাত্র সমাধান মনে করেন, এটাও সঠিক না। কারণ, শৈশবে শারীরিক নিগ্রহের শিকার হলে বড় হওয়ার পরেও তাদের মাঝে অজানা শঙ্কা থেকে যায়।

আমরা জানি, চিকিৎসা বিজ্ঞানে সর্বশেষ প্রতিষেধক হিসাবে ক্ষত স্থানে সেক দেওয়ার প্রচলন আছে। তেমনিভাবে বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়ার সকল উপায় ব্যর্থ হলে তখন প্রহার করা যেতে পারে। কিন্তু বাচ্চাকে শেখানোর ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে প্রহার করার প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে কমে যায়।

অনেক বাবারা বাচ্চাদের ছোটখাট ভুলের কারণে গায়ে হাত দিয়ে বসেন। এটা আমার কাছে জুলুম মনে হয়। যারা মনে করেন, বাচ্চাদেরকে আনুগত্য, বাধ্যবাধকতা ও শিষ্টাচার শেখানোর জন্য কঠোরতার কোনো বিকল্প নেই; তারা ভুলের মধ্যে আছেন। বরং অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কঠোরতার কারণে বাচ্চাদের মধ্যে নির্বুদ্ধিতা, নিষ্ক্রিয়তা এবং নানান মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা তৈরি হয়। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কাউকে প্রহার করেননি। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ছাড়া নিজ হাতে তার স্ত্রী, সেবক বা অন্য কাউকে মারেননি।’^[১]

একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি গোলাম নিয়ে আসলেন। তিনি একটি গোলাম আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়ে বললেন, ‘একে মারধর করো না। কেননা, যে সালাত আদায় করে, তাকে মারতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর তার আসা অবধি আমি লক্ষ্য করেছি যে, সে সালাত আদায় করে।’^[২]

অন্য জায়গায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাবাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ‘ঘরে এমনভাবে লাঠি ঝুলিয়ে রাখো, যাতে ঘরের লোকেরা দেখতে পায়।’^[৩]

সুতরাং, হাদিসে প্রহার করতে নিরুৎসাহিত করার অর্থ এই না যে, আপনি পরিবার এবং সন্তানের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন থাকবেন। বরং আপনার গাভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, রাশভারী চেহারা এবং পরিবারের প্রতিটি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা জরুরি। সন্তানের পড়াশোনা এবং আখলাকের ব্যাপারেও আপনাকে সজাগ থাকতে হবে।

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫৮৪২

[২] আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ১৬৩

[৩] সহিহুল জামে’



খেলতে খেলতে শেখা

শিশুদের একটি কৌতূহলী মন আছে। তারা সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতে চায়। হাতের নাগালে যা পায় তাতেই তাদের অনুসন্ধিৎসু মন একটু নতুন কিছু খুঁজে ফেরে। এমনকি খেলনাগুলো পর্যন্ত তাদের হাত থেকে রেহাই পায় না। সেগুলো ভেঙে তার ভিতরও তাদের গবেষণা কর্ম চলতে থাকে। আর এ নিয়ে বাবাদের অভিযোগের শেষ নেই।

শিশুরা নতুন কিছু দেখলে আগ্রহবোধ করে এবং চারপাশে যা কিছু দেখে তাতেই কৌতূহলী হয়ে ওঠে; আল্লাহ রাক্বুল আলামিন প্রতিটি শিশুকে কমবেশি এই যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। শিশুর প্রতিভা বিকাশের জন্য তার এই কৌতূহল ও উদ্দীপনা অত্যন্ত জরুরি। সুতরাং আমরা যদি শিশুদেরকে যেকোনো কিছু গভীরভাবে তলিয়ে দেখার সুযোগ না দেই এবং তাদের অনুসন্ধানী মনোভাবকে বাধাগ্রস্ত করি তাহলে তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে এবং তাদের প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাবে।

আমরা মনে করি, বাচ্চা ছোট থেকেই গোছালো এবং সুশৃঙ্খল হবে। এটা কখনোই সম্ভব না। বাচ্চারা ঘরদোর এলামেলো না করে কখনোই গোছাতে শেখে না। বাচ্চারা দশটা খাতা নষ্ট না করে কখনোই লিখতে শেখে না। তাকে তার কাজ করতে দিন। আপনি যদি বাচ্চার স্বাভাবিক

চাপ্গুল্যকে দুষ্টুমি মনে করেন, তার অনুসন্ধানী কাজকর্মে বিরক্ত হন এবং এর জন্য তাকে শাস্তি দেন তাহলে আপনি তার শিক্ষা ও মননশীলতাকে গলা টিপে হত্যা করলেন।

গবেষণায় দেখা গেছে, বাচ্চাদের আগ্রহের দ্রুত পরিবর্তন এবং কিছু দিন পরপর মানসিকতা বদলে যাওয়াটাই তাদের প্রতিভা বিকাশের প্রাথমিক লক্ষণ। অতএব বাচ্চার শারীরিক সুস্থতা এবং সৃজনশীল মানসিকতার জন্য তার খেলাধুলা, ছোট্টাছুটি ও দৌড়ঝাঁপ স্বাভাবিক কার্যকলাপ হিসাবে দেখুন। বাচ্চার খেলাধুলা ও চঞ্চলতা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই; বরং সে যদি নিজীব থাকে এবং খেলাধুলা না করে সেটা উদ্বেগের বিষয়। ইমাম গাযালী তার ইহইয়াউ উলুমিদীন গ্রন্থে বলেছেন, ‘বাচ্চাদের কুরআনের দারস বা যেকোনো পড়াশোনা শেষে খেলাধুলা করার সুযোগ রাখা উচিত। এতে তারা পড়াশোনার চাপ থেকে মুক্তি পাবে। বাচ্চাদেরকে ক্রমাগত পড়াশোনার মাঝে আটকে রাখলে তাদের মন-মস্তিষ্ক অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে তাদের মন বিষণ্ণতায় ছেয়ে যায়।’

খেলাধুলার মধ্যে শিশুদের জন্য যেসব উপকারিতা রয়েছে-

- ⊙ খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুর দৈহিক পরিশ্রম হয় এবং শারীরিক শক্তি ব্যয় হয়। বাচ্চাদের মাঝে প্রচুর উদ্যম ও প্রাণচাপ্গুল্য থাকে। তাদেরকে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখলে তারা নিজীব হয়ে পড়বে।
- ⊙ খেলাধুলা করলে শিশুর মাঝে উদ্ভাবনী শক্তি ও সৃজনশীলতা তৈরি হয়। ধারাবাহিক কসরত এবং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে যেকোনো কাজে লেগে থাকলে তারা আস্তে আস্তে মননশীল হয়ে উঠবে।
- ⊙ খেলাধুলার মাধ্যমে বাচ্চারা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে পরিচিত হয়। বিশেষ করে বিভিন্ন দলবদ্ধ খেলার



বহুমুখী দক্ষতার পাঠ

জীবন আর আগের মতো নেই। দুনিয়ার ধারা পাঁটে গিয়েছে, সাথে বদলে গিয়েছে জীবনের গতিও। আগেকার জীবন ছিল বৈচিত্রে ভরা। কিন্তু আজকাল যান্ত্রিকতা সে জায়গা দখল করেছে। আগে যা ছিল বিলাসিতা, তা এখন নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে উপার্জনের জন্য দক্ষতার বেশি প্রয়োজন হয় না। দরকার শুধু একটুখানি সুযোগের। চোখ-কান খোলা রেখে একটু সুযোগের সন্ধানে থাকতে হবে। চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সুযোগ পেলে লুফে নিতে হবে; আর না পেলে তৈরি করে নিতে হবে।

একটা সময় আরবরা তাদের সন্তানদের শুধু পড়ালেখা শেখাত না। তাদেরকে জীবনে চলার জন্য নানামুখী দক্ষতাও শেখাত। তখন আরবদের সুদিন ছিল। হাজ্জাজের একটা উক্তি প্রসিদ্ধ আছে, তিনি তার সন্তানদের শিক্ষককে বলেছিলেন, ‘বাচ্চাদেরকে লেখা শেখানোর আগে সাঁতার শিখাবেন। কারণ তাদের পক্ষ থেকে লিখে দেওয়ার জন্য কাউকে না কাউকে পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু তাদের হয়ে সাঁতার কাটার জন্য তারা কাউকে পাবে না।’

উমার ইবনুল খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহু শামের অধিবাসীদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন, ‘তোমরা বাচ্চাদেরকে সাঁতার কাটা ও তিরন্দাজি শিখাবে

এবং ঘোড়া চালনায় দক্ষ করে গরে গড়ে তুলবে। কারণ, এসব কাজে দক্ষ ব্যক্তিরাই জাতির চোখে বিশেষ সম্মানের পাত্র হয়। এরাই কওমের নেতৃত্ব দেয়।’

আজকের দুনিয়ায় বেশ কিছু দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে সেগুলোর পারদর্শিতা অর্জন অনেকবেশি গুরুত্বপূর্ণ। তেমন কিছু দক্ষতা হলো—

চিন্তাভাবনার দক্ষতা

সন্তানের মধ্যে কোনো কিছু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা, মাথা খাটিয়ে সমাধান বের করা এবং কথার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করার দক্ষতা তৈরি করুন। সে আপনার কাছে কিছু জানতে চাইলে তৎক্ষণাৎ উত্তর না দিয়ে তাকে উত্তর খুঁজতে বলুন। বিষয়টি নিয়ে তার সাথে আলোচনা করুন এবং তাকে সমাধানে পৌঁছতে সাহায্য করুন।

বাচ্চা আপনার কাছে এসে বলল, ‘বাবা, আমরা যে পানি ব্যবহার করি, সেগুলো কোথা থেকে আসে?’ অমনি আপনি বলে দিলেন, ‘কেন পানির লাইন বা নদী থেকে আসে!’ এটা ঠিক হলো না। বরং আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন, ‘তুমি বলো দেখি বাবা, কোথা থেকে আসে?’ সে যদি বলে, দেয়ালে ওপার থেকে আসে, আপনি তখন তার কাছে জানতে চান, ‘তোমার কি মনে হয়, কীভাবে আসে?’—এভাবে ধীরে ধীরে তার মুখ থেকে সঠিক উত্তর বের করতে চেষ্টা করুন।

আমরা মনে করি, বাচ্চাদের সাথে জ্ঞানের কথা বললে, তাদের সাথে বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদান করলে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়, তাদের বোধ, চেতনা ও উপলব্ধি শানিত হয়। এটা একদমই ভুল চিন্তা। বরং সঠিক পন্থা হলো, তাদেরকে মাথা খাটাতে উদ্বুদ্ধ করা, সঠিক উত্তর বের করতে সহায়তা করা কিংবা নিজে থেকে ওই তথ্য উদ্ধার করতে তাকে সাহায্য করা। তাহলে তার জানার পরিমাণ বাড়বে এবং চিন্তা



আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন এবং পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনের মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। মুসলিম হিসাবে আমাকে ও আপনাকে যেমন দ্বীনের ওপর অটল থাকতে হবে, তেমনি বাচ্চাদেরও দ্বীন পালনে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। পরিবারের প্রধান ও বাবা হিসাবে এটা আমার ও আপনার দায়িত্ব।

তবে দ্বীনের সাথে বাচ্চাদের পরিচয় করাতে গিয়ে কোনোভাবেই ভয়-ভীতির আশ্রয় নেওয়া যাবে না। দ্বীন পালনে অভ্যস্ত করতে তাদেরকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখাবেন না। তাহলে সে মনে করবে, আল্লাহ সব সময় তার ভুলত্রুটির অপেক্ষায় থাকেন।

আগেও বলেছি, ভয় দেখিয়ে কোনো কাজে অভ্যস্ত করানোটা বাচ্চাদের জন্য মঙ্গলজনক নয়। বরং আপনি তার মাঝে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করুন। খুব যত্ন সহকারে রবের সাথে তার গভীর সম্পর্ক জুড়ে দিন। দেখবেন, দ্বীনের ব্যাপারে সে নিজেই আগ্রহী হয়ে উঠবে। ইবাদাতের প্রতি তার ছোট্ট হৃদয়ের গহীন কোণে অন্যরকম ভালো লাগা তৈরি হবে। ইবাদাত থেকে সে পালিয়ে বেড়াবে না। বরং আল্লাহর অবাধ্যতা এবং গোনাহ থেকে সে সানন্দে বিরত থাকবে।

উস্তায় সাইয়েদ কুতুব বলেন, ‘আল্লাহর ক্রোধ, শান্তি, আগুন বা জাহান্নামের ভয়াবহতা বাচ্চাদের সামনে বেশি আলোচনা করাটা কোনো বাবার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ না। যেভাবে কুরআন-সুন্নাহে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্রোধের কথা পাশাপাশি এসেছে, যেখানে পুরস্কারের ঘোষণা তার সাথেই শান্তির ভয় দেখানো হয়েছে, ঠিক সেভাবে উভয় বিষয়ে ভারসম্য বজায় রেখে বাচ্চাদের সাথে কথা বলা উচিত।’

উৎসাহমূলক কথা দিয়ে শুরু করতে হবে; ভীতিকর আলোচনা একদমই না। তাহলে রবের সাথে তার আশা ও ভালোবাসার একটা বন্ধন তৈরি হবে। কেননা শৈশবে বাচ্চারা স্নেহ-ভালোবাসা পেলে আরও উৎসাহবোধ করে। তবে পরোক্ষভাবে তাদেরকে ভয় দেখাতে সমস্যা নেই।

যেমন, ভালো কাজের উৎসাহ দিতে গিয়ে আপনি বলতে পারেন, ‘তুমি এই কাজটি করলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর ওমনটা করলে তিনি রাগান্বিত হবেন। আমি জানি, তুমি ভালোটাই করবে। তুমি তো আর দুষ্ট ছেলেদের মতো খারাপ কাজ করো না। যারা খারাপ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন।’ এমন প্রচ্ছন্নভাবে আপনি বাচ্চাদেরকে শান্তির কথা বলতে পারেন। এভাবে তার শৈশবের কোমলতায় আঘাত না করেই কাজিফত ভয় তার মাঝে এসে যাবে।”

ছোটবেলা থেকে যে শিশু আল্লাহর ভালোবাসা নিয়ে বেড়ে উঠবে সে সারাজীবন আত্মিক প্রশান্তি লাভ করবে, আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা লালন করবে এবং তার অন্তর হিংসা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের মতো আত্মিক ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকবে। বর্ণিত আছে, দাউদ আলাইহিস সালাম এই বলে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, ‘হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য যেমন ছিলেন, আমার সন্তানের জন্যও তেমন হয়ে যান।’ আল্লাহ তায়ালা বললেন, ‘দাউদ! তোমার ছেলেকে বলো, আমার সাথে তোমার যেমন সম্পর্ক ছিল, সে যেন আমার সাথে তেমন সম্পর্ক গড়ে



মেধার মূল্যায়ন

মেধাবী ও বুদ্ধিমান সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামাত। এই নিয়ামাতের মূল্যায়ন করা উচিত। মেধাবী ও প্রতিভাবান বাচ্চাদের সাথে আচরণ করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, যাতে আমাদের কোনো আচরণে তাদের মেধা ও বুদ্ধিমত্তা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এ ধরনের বাচ্চাদের সাথে আচরণের ব্যাপারে কথা বলার আগে আমি দুটো বিষয় বলতে চাচ্ছি-

এক. একটি শিশুর উন্নতি, অগ্রগতি ও ইতিবাচক যোগ্যতা তৈরির পিছনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবদান থাকলেও কিছু শিক্ষাবিদরা মনে করেন, শুধু একাডেমিক বৈশিষ্ট্য দিয়েই একজন প্রতিভাবান শিশুকে শনাক্ত করা সম্ভব নয়। কারণ, ইতিহাসে এমন অনেক নজির আছে—বহু জ্ঞানীশূণী ব্যক্তিদের ছাত্রজীবন খুব একটা সাফল্যমণ্ডিত ছিল না। পড়াশোনায় তারা বরাবরই পিছিয়ে ছিলেন। ভেনিজুয়েলার একজন মন্ত্রী বলেছিলেন, ‘প্রতিভা যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হয়। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা শিশুদের মাঝে প্রতিভা তৈরি করে না, বাচ্চাদেরকে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান বানায় না।’

দুই. আপনার জানা থাকার কথা, প্রতিটি শিশুই কোনো না কোনো প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তবে জাগতিক নিয়ম-কানুন, সামাজিক

শিক্ষা, পারিবারিক শিক্ষা এবং সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা তার সুপ্ত প্রতিভা ধীরে ধীরে জাগ্রত ও বিস্তৃত করে। তখন আমরা শিশুর মাঝে চমৎকার বাকশৈলী, বিচক্ষণতা, আলোচনার দক্ষতা এবং উপস্থাপনায় পারদর্শিতা দেখতে পাই।

শিশুর মনোবিজ্ঞান ও মেধা বিকাশ নিয়ে যারা গবেষণা করেন তারা কিছু প্রতিভার কথা বলে থাকেন, যেগুলো সাধারণত একটি প্রতিভাবান শিশুর মাঝে পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিভাবান শিশুর বৈশিষ্ট্য—

- ⊙ এ ধরনের শিশুরা দ্রুত অর্থবোধক বাক্য তৈরি করতে শিখে যায়। পাশাপাশি তাদের সমবয়সীদের তুলনায় তারা তাড়াতাড়ি কথা বলতে শুরু করে।
- ⊙ উপযুক্ত পরিবেশ পেলে তারা সহজে যেকোনো কিছু শিখে ফেলে।
- ⊙ প্রশ্নের সন্তোষজনক ও যথার্থ উত্তর না পেলে তারা বিরক্ত হয়।
- ⊙ তাদের সমবয়সীদের তুলনায় তারা আগে পড়া শিখে যায় এবং দ্রুত পড়তে পারে।
- ⊙ তাদের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর এবং স্মরণশক্তি খুব শানিত হয়। তাদের মাঝে যেকোনো কিছু গভীরভাবে পরখ করার এবং সুক্ষ্ম বিশ্লেষণের যোগ্যতা থাকে।
- ⊙ জানার জন্য তাদের প্রবল বাসনা থাকে। শেখার প্রতি তারা খুব আগ্রহী হয়। যেকোনো বিষয়ে তারা কৌতূহলী হয়ে ওঠে এবং প্রশ্ন করতে শুরু করে- ‘এটা কি, কেন বা কোথায়?’
- ⊙ তারা অত্যন্ত যুক্তিসংগত চিন্তা করতে পারে। তাদের ভাবনাগুলো যৌক্তিক হয়।



বয়ঃসন্ধি

বয়ঃসন্ধি প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটি অনিবার্য প্রক্রিয়া। এই পর্যায়ে একটি শিশু প্রাপ্তবয়স্ক মানুষে পরিণত হয়। এ সময় একই সাথে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। শৈশব ও যৌবনের এই সন্ধিক্ষণে এসে প্রতিটি কিশোর-কিশোরী যৌনতার প্রতি দুর্বীর আকর্ষণ অনুভব করে। এই আকর্ষণের তীব্রতা এবং কামনার প্রভাব এতটাই শক্তিশালী যে, কোনো মানুষের পক্ষে এটা উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না।

উস্তায় সাইয়েদ কুতুব বলেন, ‘যৌনতা মানুষের মধ্যে একটি স্বাভাবিক অবস্থা এবং অত্যাৱশ্যক শক্তি। আল্লাহ তায়ালা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষের মাঝে এই শক্তি দান করেছেন, মানুষের অনুভূতি ও চিন্তায় এর বিস্তার ঘটিয়েছেন এবং এর প্রভাবকে মানুষের শারীরিক সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য রেখেছেন; যাতে শারীরিক সক্ষমতা ও যৌনাকাঙ্ক্ষার মাঝে ভারসাম্য বজায় থাকে এবং উভয়টা সমানভাবে কাজ করতে পারে। যেভাবে অন্যান্য মানবিক চাহিদার ক্ষেত্রেও শারীরিক ও মানসিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা হয়েছে।’

মানুষের সকল প্রয়োজন এবং প্রতিটি কাজে যেমন শারয়ী নীতিমালা আছে, তেমনি এই মানবীয় চাহিদার ক্ষেত্রেও আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঐশীবিধানে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, বিধিবিধান ও আইনী নীতিমালা

প্রণয়ন করেছেন, যাতে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য সামনে রেখে মানুষ নিরাপদ ও বৈধ পন্থায় এই চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে।

ইসলাম কখনো যৌনাকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করে না এবং এর চাহিদাকেও অস্বীকার করে না। আবার অবাধ যৌনতা এবং উদ্দাম যৌনাচারও অনুমোদন করে না; বরং এর জন্য সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও বিধানের আলোকে এই চাহিদা পূরণ করা অবশ্যক করেছে।

বাচ্চাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও তারবিয়াতের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অনুসরণ না করার কারণে অনেক সমস্যা তৈরি হয়েছে এবং যৌনতার প্রকৃতি ও বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সেই সমস্যার মোকাবেলা আরও জটিল হয়ে গেছে।

যৌনতা ইসলামে কোনো সমস্যা বা অপরাধ নয়। কিন্তু আপনার এই ক্ষমতা যদি আপনি যথেষ্ট ব্যবহার করেন এবং অন্যায় পথে এই চাহিদা পূরণ করেন, তাহলে সেটা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং নিয়ন্ত্রিত ও সংযত যৌনাচার নিশ্চিত করতে ইসলাম নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকসহ সব ক্ষেত্রে বিধান আরোপ করেছে।

আমরা গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখব যে, ইসলাম আল্লাহর ভয় ও তাঁর ভালোবাসাকেই একটা শিশুর জীবনের প্রথম শিক্ষা হিসেবে নির্ধারণ করেছে। ফলে সৃষ্টিকর্তার সাথে পরিচয়ের শুরু থেকেই রবের ভালোবাসা ও ভয় তার অন্তরে গেঁথে যায়। সুতরাং, ছোট থেকে যখন সে অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয় নিয়ে বেড়ে উঠবে এবং যৌনতার ক্ষেত্রে নিজেকে সংযত রাখতে অভ্যস্ত হবে তখন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরেও তার এই অভ্যাস থেকে যাবে এবং বয়ঃসন্ধির শুরুতে যৌবনের তীব্র তাড়নায় আল্লাহর ভয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।